আমাদের নির্বাচনী জরিপসমূহ কেন সঠিক পূর্বাভাস দিতে ব্যর্থ হয়?

আ হ সা ন মো হা ম্ম দ

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমত জরিপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকার বা প্রধান রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের পর মিডিয়া, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন জনমত জরিপ চালায়। তার মাধ্যমে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো জনমতকে বুঝতে পারে এবং সে অনুপাতে তাদের কর্ম কৌশল নির্ধারণ ও প্রয়োজনে সংশোধন করতে পারে। ফলে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলির গণমুখীতা বৃদ্ধি পায়। নির্বাচনের পূর্বে তার সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে এ ধরণের জরিপের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক বেড়ে যায়। নির্বাচনী জরিপ যেমন রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের নির্বাচনী কৌশল নির্ধারণে সহায়তা করে তেমনি কখনও কখনও নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করতেও ব্যবহৃত হয়। নির্বাচনকে ঘিরে জনগণের কৌতুহণ এতো বেশী থাকে যে হার জিত নিয়ে বড় বড় বাজি ধরার মত ঘটনা ঘটে। তবে বাংলাদেশে ইতোপূর্বেকার নির্বাচনী জরিপের ফলাফল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তবের সঙ্গে মেলেনি, এমনকি একোবারে উল্টো হবার নজীরও কম নয়। যেমন ১৯৯১ ও ২০০১ এর নির্বাচন পূর্ব অধিকাংশ জরিপ ও বিশ্লেষণে আওয়ামী লীগের নিশ্চিত বিজয়ের কথা বলা হয়েছিল। সে সকল জরিপে আরেকটি দল সম্পর্কে এমন ধারণা দেয়া হয়েছিল যে দলটি তিনটি আসন পাবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু বাস্তবে সে রকমটি ঘটেনি। আমাদের দেশে পরিচালিত নির্বাচনী জরিপগুলোর নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে পারার ব্যর্থতার পিছনে নিম্নলিখিত কারণগুলো কাজ করতে পারেঃ

১. অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজধানী,বড় জোর তার বাইরের কয়েকটি শহরেকে জরিপের এলাকা হিসাবে নির্ধারণ করা হয় এবং সে সকল এলাকার কিছু লোকের উপর পরিচালিত জরিপের ফলাফল দিয়ে সারা দেশের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করা হয়। ধরে নেয়া হয় যে একজন ভোটার দলীয় সমর্থনের উপর ভিত্তি করেই ভোট দিবেন। কিন্তু ভোটের সময় কোন দলকে সমর্থনের চেয়ে ব্যক্তি হিসাবে প্রার্থীকে সমর্থন কম ভূমিকা রাখে না। আমাদের দেশে সংসদ সদস্যগণ যতটুকু না আইন প্রণেতা তার থেকে অনেক বেশী স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধি। সাধারণতঃ একটি দলের প্রতি সমর্থন নির্ভর করে দলটির সাংগঠনিক তৎপরতা ও বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুর উপর। কিন্তু নির্বাচনের সময়ে ভোটারগণ যেমন দল দেখেন তেমনি প্রার্থীর ব্যক্তি ইমেজ, তিনি স্থানীয় জনগণের আপদে বিপদে কতটুকু পাশে থাকেন, এলাকার উন্নয়নে কতটুকু কাজ করেন ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচনা করেন। ফলে দেখা যায় যে প্রার্থী বদল করা হলে নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে যায়। আবার অনেকে দলীয় হাই কমান্ড কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্রভাবে দাড়িয়ে বা নির্বাচনের আগে দল বদল করেও জয়ী হন। স্থানীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে ব্যর্থতার কারণে অনেক প্রার্থী তার দলের শক্তিশালী সাংগঠনিক ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও পরাজিত হন। এ ঘটনা বেশী ঘটে থাকে বড় দুই দলের বাইরের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দলগুলোর ক্ষেত্রে যাদের দল ক্ষমতায় যাবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এর সবথেকে বড় ভূক্তভোগী হচ্ছে জামায়াত। অতীতের নির্বাচন সমূহে দেখা গেছে যে দলটির খুব কম সংখ্যক সংসদ সদস্য পরবর্তী নির্বাচনে বিজয় অর্জন করতে পেরেছেন। জনগণ শুধু আদর্শের জন্য ভোট দেয় না। তারা চায় যে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি এলাকার উন্নয়ন করবে এবং তাদের জন্য বিভিন্ন সরকারী সুযোগ-সুবিধা এনে দিবে। ২০০১ এর নির্বাচনের পর সরকারে

অংশ নেয়া এবং সে সুযোগে এই প্রথমবারের মত নিজ নিজ এলাকায় উন্নয়ন করতে পারার কারণে জামায়াত এ বিষয়ে আগের থেকে অনেক বেশী সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতে পারে।

২. কোন দলীয় সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে যে সকল জরিপ পরিচালিত হয় সেগুলিতে ক্ষমতাশীনদের প্রতি জনগণের, বিশেষ করে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, ক্ষোভ প্রকাশ পায়। তাছাড়া প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভূমিকা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমতাশীনদের বিপক্ষে যায়। এ ক্ষেত্রে কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা ক্ষমতাশীনদের জন্য একটি আশীর্বাদ স্বরূপ কাজ করে। একটি দলীয় সরকার যখন কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ক্ষমতা থেকে নেমে যায়, তখন সরকারী দল ও বিরোধী দল উভয়েই এক কাতারে চলে আসে। ক্ষমতাশীনদের প্রতি ক্ষোভ তখন তেমন আর থাকে না। জনগণ কিছুদিন পূর্বেকার ক্ষমতাশীন ও বিরোধী দলকে একই পাল্লায় বিচার করার সুযোগ পায়। মিডিয়াও সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি দেয়ার সুযোগ পায়। আওয়ামী লীগ যখন ২০০১ সালের নির্বাচনে ১৯৯৬ এর নিবাচন থেকে বেশী হারে ভোট পেয়েছিল তখন সকলেই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কেননা, দলটির শাসনামলে সন্ত্রাসের ব্যাপক বিস্তৃতি, সন্ত্রাসীর গডফাদারদেরকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কতৃক প্রকাশ্য সমর্থন ও ক্ষেত্র বিশেষে উসকানি দান, বিদ্যুৎ সমস্যা (এ সমস্যা মাঝে এতো প্রকট হয়েছিল যে লোকেরা মোমবাতি কিনতে গেলে বলতো, 'দুই টাকার হাসিনা দেন'), ক্ষমতা থেকে বিদায় নেবার মাত্র কয়েকদিন পূর্বে গণভবনকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর নিজের নামে লিখে নেয়া ইত্যাদির কারণে ক্ষমতাশীনদের প্রতি যে ক্ষোভ মানুষের মধ্যে জন্মেছিল তার পুরোপুরি প্রতিফলন ঘটলে দলটির ভোটের হার অনেক কমে যেতো। কিন্তু কেয়ারটেকার সরকারের 'বাফার' সময়টি জনগণের ক্ষোভের তীব্রতা প্রশমিত করতে সাহায্য করেছে যা আগামীতেও করতে পারে।

৩. আমাদের দেশে সদ্য ক্ষমতা হস্তান্তরকারী দল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ক্ষমতার কিছু সুবিধা লাভ করে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভার মেম্বার-চেয়ারম্যানদের মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়নের বাইরেও এমন কিছু খাতে সরকার অর্থ ব্যয় করে যাতে তারা জনসাধারণকে ব্যক্তি পর্যায়ে অর্থ সাহায্য করতে পারে। তাদের মাধ্যমেই ভিজিএফ কার্ড, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, সরকারী যাকাত ফান্ডের অর্থ প্রভৃতি বিতরণ করা হয়। ফলে গ্রামাঞ্চলের ভোটারদের প্রভাবিত করতে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বিএনপি ও জামায়াত অংশ নেয় নি। ফলে সেখানে তাদের একক আধিপত্য ছিল। ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রাপ্ত ভোট বৃদ্ধির পিছনে বিষয়টির ভূমিকা ছিল। বর্তমানের স্থানীয় সরকারসমূহে ক্ষমতাশীন জোটের প্রাধান্য রয়েছে যা নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে।

৪. নির্বাচনের ফলাফল জরিপের সাথে না মেলার একটি প্রধান কারণ জরিপ পরিচালনা পদ্ধতির দুর্বলতা। বিভিন্ন দলের সমর্থকরা তাদের সমর্থন প্রকাশের বিষয়ে সমভাবে মুক্তকণ্ঠ ও সাহসী নয়। এ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সমর্থকদেরকে সবথেকে এগিয়ে এবং জামায়াত সমর্থকদেরকে সবথেকে পিছিয়ে থাকতে দেখা যায়। মাঝামাঝি রয়েছে জাতীয় পার্টি ও বিএনপি। অফিস-আদালত, চায়ের দোকান, পাড়া-মহল্লা কোথাও আওয়ামী লীগের একজন সমর্থক তার রাজনৈতিক সমর্থন প্রকাশের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কোন রাখঢাক করে না। কিন্তু জামায়াতের সক্রিয় কর্মীও অনেক ক্ষেত্রে তার রাজনৈতিক পরিচয় গোপন রাখতে চান। একজন সরকারী কর্মকর্তা জামায়াতের একজন সক্রিয় কর্মী হলেও তার অফিসে তিনি তা প্রকাশ করবেন না। এর কারণও রয়েছে। সাধারণতঃ দেখা যায় কেউ জামায়াতের

সমর্থক একথা জানাজানি হলে চাকুরীতে হয়রাণি, বিশ্ববিদ্যালয়ে মারপিট ইত্যাদির শিকার হতে হয়। রাজধানীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রায়ই 'শিবির সন্দেহে' অনেককে শারিরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়।

এই বিষয়টি জরিপের ফলাফলের উপর প্রভাব ফেলে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর জনসমর্থনের প্রকৃত চিত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধা হিসাবে কাজ করে। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। ২০০১ এর নির্বাচনের পুর্বে যে সকল জরিপ ও বিশ্লেষণ করা হয় তার মধ্যে যেটি সবথেকে নিখুত পূর্বাভাস দিতে পেরেছিল সেখানেও দেখা গিয়েছিল যে জামায়াত ৩% অর্থাৎ ৯ আসন পাবে। অথচ বাস্তবে তারা পেয়েছিল দ্বিগুন। প্রকৃতপক্ষে জরিপের প্রশ্নের উত্তরে যারা বলেন যে এখনও ঠিক করেন নি কাকে ভোট দিবেন তাদের একটি বড় অংশ জুড়ে থাকেন তারা যারা তাদের রাজনৈতিক সমর্থনের কথা প্রকাশ করতে চান না।

৫. বিএনপি জামায়াত জোটের প্রতি শুরু থেকেই ধর্মীয় শ্রেণীটির সহানুভূতি একটু বেশী থাকলেও বর্তমানে তা অনেকগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। জোট সরকারের একটি সিদ্ধান্ত তাদের পুরো জীবনযাত্রাকে পাল্টে দিতে যাচ্ছে। এতোদিন মাদ্রাসা শিক্ষার সমমান ছিল না। সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়েও একজন শিক্ষার্থী সরকারী চাকুরীতে পরীক্ষা দেয়ার যোগ্য বিবেচিত হোত না। সংসদের বিগত অধিবেশনে মাদ্রাসা শিক্ষার সমমানের বিলটি পাশ হয়েছে। এখন আলিয়া মাদ্রাসাগুলো থেকে পাশ করা লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী সরকারী ও বেসরকারী চাকুরীতে যোগ দিতে পারবেন। তাদেরকে এখন আর শুধু মাত্র ইমাম মুয়াজ্জিন হিসাবে অন্যের দানের টাকায় চলতে হবে না। ভোটের হিসাবে বিষয়টিকে অন্তভূক্ত না করলে বিরাট ভুল হবে।

৬. আমাদের শিক্ষিত এলিট শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া পক্ষপাত দুষ্টতা নির্বাচন জরিপের ফলকে বস্তুনিষ্ট হতে দেয় না। রাজনৈতিক মতাদর্শের বিপক্ষে গেলেও সত্যকে সঠিকভাবে প্রকাশ করা নিয়ে সম্প্রতি একটি ইন্টারনেট একটি বিতর্ক হয়েছিল। বহু নিবাসী ও প্রবাসী বাংলাদেশী এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য পাঠিয়েছিলেন। অনেকেই সরাসরি বলেছিলেন যে কোন কিছু যদি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীদের বিপক্ষে যায় তাহলে তা যতবড় সত্যই হোক তাকে প্রকাশ করা অনুচিৎ। সম্ভবতঃ এ কারণে নির্বাচনী জরিপ ও বিশ্লেষণগুলো রাজনৈতিক পক্ষপাতকে অতিক্রম করতে পারে না। এ পক্ষপাতের কবলে আটকে থাকেন যেমন মাঠ পর্যায়ের জরিপকারীরা, তেমনি জরিপের ফলাফল যারা বিশ্লেষণ করেন তারাও এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন না। সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত একটি আলোচিত জরিপ ও তার বিশ্লেষণের বিষয়ে এ ধরণের অভিযোগ উঠেছে। বিশ্লেষণে বলা হয়েছে যে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৮০ টি ও চারদলীয় জোট এরশাদকে সহ ৮০ টি আসন পাবে। বিশ্লেষণকারী তাঁর বক্তব্যকে গ্রহণযোগ্য করতে জানিয়েছেন যে এককালে তিনি বিএনপির এমপি ছিলেন এবং তাঁর ভোটতত্ব প্রয়োগ করে তিনি ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে যে ১৯৭৯ সালের নির্বাচন তেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ছিল না। অনেকে তাকে সাজানোও বলেন। ১৯৯১ সালের নিরপেক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনে তাঁর ভোটতত্ব কোন কাজে লাগে নি এবং তিনি সে নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন। তার মতে আওয়ামী লীগ আগামী নির্বাচনে ৫৩% ভাসমান ভোটের বেশীরভাগ পাবে। অথচ বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল এবং বাগেরহাটের ১৫টি আসনের ভোট বাদ দিলে আওয়ামীলীগের ভোট হয় মাত্র ২৩%। তার বিশ্লেষণ দেখে মনে হবে যে দলীয় কোন্দল শুধু বিএনপিতেই রয়েছে, আওয়ামী লীগে নেই এবং বিএনপির সম্ভাব্য বিদ্রোহী প্রার্থীদের সামনে তাদের নিজ দলকে পরাজিত করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য থাকবে না।

চরাদলীয় জোটের বর্তমান ও সম্ভাব্য শরীকদেরকে তিনি যেভাবে খুবই তুচ্ছ করে দেখিয়েছেন তাতে বস্তুনিষ্ঠতার বদলে বিশেষ কিছু প্রমাণ করার প্রবনতা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে বলে অনেকে মনে করছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, জামায়াতের কোন জনসমর্থন নেই এবং দলটির সাংগঠনিক ভিত্তি অতি দূর্বল। তিনি আরও বলেছেন, এরশাদের সমর্থকেরা বিএনপিকে ভোট দেবে না। এরশাদের সমর্থকেরা বিএনপিকে ভোট দিবে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহের কিছুটা অবকাশ থাকলেও জামায়াতের সাংগঠনিক ভিত্তি দূর্বল এ কথা বিশ্বাস করা সত্যিই খুব কঠিন। দলটিতে চেইন অব কমান্ডের কোন সংকট রয়েছে বলে কোন কিছু শোনা যায় না। তাদের কর্মী সংখ্যাও যে গত কয়েক বছরে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে তা তাদের জনসমাবেশগুলো দেখলে বোঝা যায়। উক্ত বিশ্লেষকের বক্তব্য অনুযায়ী দলটির তেমন জনসমর্থন নেই এবং তার সাংগঠনিক ভিত্তিও দুর্বল। তাহলে দলটির মিটিং-মিছিলে এতো মানুষ আসে কোথা থেকে? তাছাড়া তাদের প্রতিপক্ষরাই তো বলে আসছেন যে 'মৌলবাদের অর্থনীতি' দিন দিন তার কলেবর বাড়াচ্ছে। তারা নাকি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, ব্যাংক-বীমা, শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে তাদের সংগঠন ও জনসমর্থন বৃদ্ধি করে চলেছে।

এ সকল কারণে কেউ কেউ এর পিছনে রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি খুজে পাচ্ছেন। তাদের মতে তিনি বিএনপিকে বোঝাতে চাচ্ছেন যে জামায়াত বা জাতীয় পার্টির সাথে জোট বেধে লাভ নেই। এটিকে অনেকে জোট ভাঙ্গার আওয়ামী লীগের পুরানো কৌশলের নতুন সংস্করণ বলে মনে করছেন।

পরিসংখ্যান, জরিপ, তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ইত্যাদি যেমন সত্যকে প্রকাশ করার মাধ্যমে জনগণ ও সংশ্লিষ্ট মহলকে সঠিক পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করে, তেমনি সেগুলির অসৎ ব্যবহার একদিকে যেমন মিথ্যাকে সত্য হিসাবে প্রচারের পথ সুগম করে তেমনি সব মহলকেই বিভ্রান্ত করতে পারে। এমনকি যাকে সাহায্য করতে মিথ্যার অবতারণা সেও সে মিথ্যার ফাঁদে পড়ে যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে একটি মজার গল্প রয়েছে। প্রেসিডেন্ট বুশ জঙ্গলে গেছেন বাঘ শিকার করতে। তিনি বাঘের দেখা পেলেন, দুটি গুলিও ছুড়লেন। একটি গুলি গিয়ে লাগলো বাঘের থেকে পাঁচ মিটার সামনের একটি গাছে, আরেকটি লাগলো পাঁচ মিটার সামনের একটি গাছে। বুশের যখন মান যায় যায় অবস্থা তখন তার একজন পরিসংখ্যানবিদ বন্ধু এলেন তাঁকে উদ্ধার করতে। তিনি হিসাব নিকাশ করে, অংক কষে ও গ্রাফ এঁকে প্রমাণ করলেন যে বুশের গুলি বাঘের দেহেই বিদ্ধ হয়েছে, কেননা গড় করলে সেই ফলাফলই দাড়ায়।